1 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বস্তিতে রিপোর্ট কার্ড, বিনামূল্যের বই ও শিক্ষাবাণিজ্য

সময়ের কথা | অজয় দাশগুপ্ত

সাংবাদিক

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় এক দশক বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম। স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য হিসেবে কাজ করেছি। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন সমন্বয়ে জাতীয় ছাত্রলীগ নামে যে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, তার ২১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলাম। আশির দশকের ছাত্র সংগঠনগুলো এইচএম এরশাদের সামরিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল সফলভাবে। এ সময়েও ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ মিলেছে। ১৯৭৩ সালে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ যৌথভাবে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিল। এ কমিশনের রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছিল ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের সদস্যদের কাছে। এ রিপোর্ট প্রণয়নেও আমি বিশেষভাবে উদ্যোগী ছিলাম। মনে আছে, সে সময়ে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মাহবুব জামান, ছাত্রনেতা কাজী আকরাম হোসেন ও আমি যেদিন শিক্ষা কমিশনের কাছে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখার জন্য উপস্থিত হই, ড. কুদরাত-এ-খুদাসহ কমিশনের সব সদস্য উপস্থিত থেকে আগ্রহ নিয়ে আমাদের বক্তব্য শোনেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য থাকাকালেও সিলেবাসসহ পরীক্ষা পদ্ধতি, নকল প্রতিরোধসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বক্তব্য রেখেছি। ১৯৭৪ সালের সিনেট বৈঠকে কয়েকটি নির্বাচিত কলেজে কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু সংক্রান্ত আমার উত্থাপিত প্রস্তাবটি প্রশংসিত হয়েছিল।

বলতে দ্বিধা নেই, ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সংগঠনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদানের দাবি কখনও উত্থাপন করিনি। কিংবা অন্য কোনো সংগঠন থেকেও এমন দাবি তোলা হয়নি। শিক্ষক সংগঠন কিংবা রাজনৈতিক দল থেকেও এমন প্রস্তাব আসেনি। অথচ নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদান শুরু হয়। আর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদান শুরু হয় ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে। এটা অবশ্যই মিরাকল কিংবা ম্যাজিক। আমাদের অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। লাল ফিতার দৌরাত্ম্যও মুখরোচক আলোচনার বিষয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার বিভিন্ন সময়ে 'সবেচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত' সরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রেখেছিল। দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ যে সর্বৈব অমূলক— সেটাও বলা যাবে না। তার পরও কীভাবে টানা আট বছর ধরে বছরের প্রথম দিনে এত বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর হাতে বই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে?

এ কাজ যে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে— সেটা বলা যাবে না। ২০১০ সালে ২৩ কোটিরও বেশি বই ছাপতে হয়েছিল। ২০১৭ সালের জন্য ছাপা হয়েছে ৩৬ কোটির বেশি বই। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিল ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন বিশেষ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিল। শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়াসহ অনেক রাজনৈতিক নেতার স্থান হয়েছিল কারাগারে। দেশকে 'উন্নয়নের ট্র্যাকে তুলে দেওয়া'র সংকল্প ব্যক্ত হয় এ সময়ে। সব অনিয়ম ঝেঁটিয়ে দূর করা হবে— এমন প্রচার চলে। কিন্তু ২০০৮ ও ২০০৯ সালে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সময়মতো পাঠ্যবই প্রদানের কাজ তারা করতে পারেনি। কেউ কেউ রসিকতা করে বলেছেন, অনেক বড় বড় সমস্যা নিয়ে এ সরকার ব্যস্ত ছিল তো; তাই কম বয়সী ছাত্রছাত্রীদের বই নিয়ে ভাবার অবকাশ মেলেনি। অথচ ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের পরপরই নতুন সরকার সিদ্ধান্ত নেয়— আর বেসরকারি খাতের পুস্তক ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরতা নয়। সরকারই দায়িত্ব নিচ্ছে সব ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বই দেওয়ার। এ জন্য অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমদ, জাফর ইকবাল, সেলিনা হোসেন, রতন সিদ্দিকীসহ ৮ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি পাঠ্যবই পরিমার্জনসহ বিভিন্ন দায়িত্ব দ্রুত হাতে নেয়। পাঠ্যপুস্তকের কিছু অংশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যেসব বক্তব্য ছিল, তা বাদ দেওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে সময় ছিল কম। তাদের কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে ২০০৯ সালের ১৮ অক্টোবর। তেজগাঁওয়ে ছিল এনসিটিবির কাগজের গুদাম। সেখানে আকস্মিক আগুন লাগে এবং টানা চার দিন আগুন জ্বলে। বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের উদ্যোগ ভণ্ডুল করার জন্যই একটি মহল এ কাজ করে— তা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেও এমনটি বলা হয়েছিল। কিন্তু পাঠ্যবই নিয়ে যাদের রমরমা ব্যবসা, তাদের ওপর আঘাত হানার সাহস হয়নি সরকারের। যেমন সাহস হয় না ঋণখেলাপিদের ওপর আঘাত হানার। যেমন সাহস হয় না নদী দখলকারীদের ওপর আঘাত হানার। যেমন সাহস হয় না সরকারি অর্থে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন কাজ যারা সময়মতো সম্পন্ন করে না তাদের ওপর আঘাত হানার। যেমন সাহস হয় না পরিবহন-সন্ত্রাসীদের ওপর আঘাত হানার।

কিন্তু একটি বড় অর্জন তো হয়ে গেল— বই মিলেছে সময়মতো এবং ধনী-গরিব প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নতুন বই পেয়েছে নতুন ক্লাসে আসন গ্রহণের দিনেই। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, বিদ্যালয়ে পড়াকালে কোনো বছরেই আমার পরিবার সব নতুন বই কিনে দিতে পারত না। সিনিয়র ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পুরনো বই বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে কিনেই আমাকে মাধ্যমিকের গণ্ডি অতিক্রম করতে হয়েছে। আমি নিশ্চিত, এ দেশের লাখ লাখ দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারে দশকের পর দশক এমন চিত্রই ছিল। এখন প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীরা নতুন বই নিয়ে নতুন ক্লাসে বসতে পারছে— এ যে বড় অর্জন। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অভিনন্দন পাবেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে বিভিন্ন সময়ে যারা ছিলেন, তারা ধন্যবাদ পাবেন। এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ধন্যবাদ পাবেন। বই উৎপাদন ও বিতরণের বিপুল কর্মযজ্ঞে যুক্তরাও ধন্যবাদ পাবেন।

মনে রাখা দরকার, বই প্রস্তুত করার কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সরকারি প্রতিষ্ঠান এনসিটিবি। কিন্তু বই ছাপা ও বিতরণের কাজ করে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বই বিতরণে যে ব্যয়, তার ৬০ শতাংশ আসে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ থেকে। বাকি ৪০ শতাংশ অর্থ দেয় সরকার। ঋণদাতাদের শর্ত থাকে— আন্তর্জাতিক টেন্ডার করে ঠিকাদার নির্বাচন করতে হবে। সরকার থেকে সেটা করাও হয়। এবার চীন ও ভারতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক পর্যায়ের বই মুদ্রণের কাজ পেয়েছে। এর আগে কয়েকটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান কাজ পেয়েছে। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে— আমাদের দেশে এত ভালো ভালো প্রেস থাকা সত্ত্বেও কেন ভারতীয় ও চীনা প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হচ্ছে? তবে বিদেশে ছাপা ও দেশে ছাপা বই যারা দেখেছেন (কাগজ, ছাপার মান ও বাঁধাই) তারা বলেছেন, বিদেশে ছাপা বইয়ের মান অনেক ভালো এবং যেসব জেলায় এ বই বিতরণ হয়, সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। কিন্তু এটাও অস্বীকার করা যাবে না— বিদেশে পাঠ্যবই ছাপা নিয়ে 'ভারত-বিদ্বেষী' প্রচার যথেষ্ট জোরালো।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে বই বিতরণ	
সাল	সংখ্যা
২০১০	১৯ কোটি ২১ লাখ
২০১১	২৩ কোটি ২২ লাখ
২০১২	২২ কোটি ১০ লাখ
২০১৩	২৬ কোটি ১৮ লাখ
২০১৪	৩১ কোটি ১৮ লাখ
২০১৫	৩২ কোটি ৩৮ লাখ
২০১৬	৩৩ কোটি ৩৭ লাখ
২০১৭	৩৬ কোটি ২০ লাখ

প্রাথমিকে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	
সাল	শিক্ষার্থী
২০১০	১ কোটি ৬৯ লাখ
২০১৫	১ কোটি ৯০ লাখ

মাধ্যমিকে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	
সাল	শিক্ষার্থী
২০১০	৭৪ লাখ
২০১৫	৯৭ লাখ

মাত্র আট বছরে বিনামূল্যের বই ছাপাতে হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ। শেখ হাসিনার সরকারের এ সিদ্ধান্ত ড্রপ আউট কমিয়েছে। স্কুলে স্কুলে বাড়ছে শিক্ষার্থী। গত বছর (২০১৬) অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২৩ লাখ ৪৬ হাজার পরীক্ষার্থী। আর ক্লাস ফাইভে পরীক্ষা দিয়েছিল প্রায় ৩১ লাখ ছাত্রছাত্রী। শিক্ষার প্রসারে সরকারের যে মনোযোগ, তাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এখন কাজের বুয়া, দিনমজুর, বস্তিবাসী, গাড়ির চালক-হেলপার, কারখানার শ্রমিক— সব পরিবারে রয়েছে ছাত্রছাত্রী। রাজধানীর ফুটপাত 'দখল করে থাকা' ছিন্নমূল পরিবারগুলোর ছেলেমেয়ের হাতেও ৩১ ডিসেম্বর দেখেছি গোলাপি রঙের রিপোর্ট কার্ড; ফাইনাল পরীক্ষায় কোন বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে সেটা অনেকে মিলিয়ে দেখছে গভীর আগ্রহ নিয়ে.

বিনামূল্যেই বই দেওয়া হয় প্রতি বছর। এখন ইন্টারনেটেও বই দেওয়া থাকে। কোনো শিক্ষার্থীর বইয়ের এক বা একাধিক পৃষ্ঠা নষ্ট হলে সহজেই প্রিন্ট করে নিতে পারে। ঝড়-বন্যার সময়ের কথাও মনে রাখা হয়। এ জন্য সরকার কিছু বই স্টকে রাখে। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন— আগে তো পুরনো বইয়ের কদর ছিল। এখন প্রতি বছর নতুন বই দেওয়ায় কোটি কোটি পুরাতন বইয়ের স্থান হয় ঠোঙা শিল্পে। কেউ কেউ একে 'জাতীয় অপচয়' হিসেবেও মনে করেন। বই নিয়ে যারা ব্যবসা করেন তারাও সরকারি উদ্যোগে বই প্রকাশের বিরোধী। তাদের ক্ষোভ এবং রোষও সঙ্গত। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত এক সরকারি কর্মকর্তা আমাকে বলেছেন, ক্লাস সিক্সের ১৪টি বই বাজার থেকে কিনতে হলে অন্তত ২১শ' টাকা ব্যয় পড়ত। কিন্তু সরকার তা ছাপিয়ে স্কুলে স্কুলে বিলি করছে এবং এ জন্য ব্যয় পড়ছে মাত্র ২৮০ টাকা। বইয়ের ব্যবসায়ীরা ব্যবসা হারাচ্ছে বলে মনে করতেই পারেন।

এ বছর ৩৬ কোটির বেশি বই ছাপা ও বিতরণে ব্যয় পড়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। আগামী বছর শিক্ষার্থী বাড়বে; ছাপার ব্যয়ও বাড়বে। তাহলে এবারের এক হাজার কোটি টাকা কি গচ্চা গেল?

প্রবাদ আছে— 'বুদ্ধি থাকলে ঢেউ গুনেও আয় করা যায়'। এক রাজার বাড়িতে গোয়ালা যে দুধ দিত তাতে পানির পরিমাণ বাড়তে থাকায় একদিন রাজা কারণ জানতে চান। গোয়ালা বলে, গেটের দারোয়ানকে বখরা দিতে হয় বলেই পানি বাড়াতে হচ্ছে। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে দারোয়ানকে বদলি করে দিলেন। তার কাজ— নদীর তীরে বসে থেকে ঢেউ গোনা। কিছুদিন পর দেখা গেল, ঢেউ গুনেও তার ভালো আয় হচ্ছে। নদী দিয়ে যেসব নৌকা চলত তার মাঝিদের কাছ থেকে সে অর্থ আদায় করা শুরু করে দিয়েছিল। রাজার বাড়ির দারোয়ান যে! ভয় তো পাবেই মাঝিরা! আমাদের বই ব্যবসায়ীরাও বিনামূল্যের বই থেকে যে 'লোকসান'; সেটা পুষিয়ে নিতে সহায়ক গ্রন্থ বা নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসা শুরু করে দিল। এ ধরনের সহায়ক গ্রন্থ ব্যবসায়ে ভালো লাভ এনে দেয় বটে, কিন্তু ক্ষতি করে শিক্ষার। দেখা গেছে, ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই কিনতে যত টাকা ব্যয় পড়ত, নোট-গাইড কিনতে তার চেয়ে ব্যয় বেশি পড়ছে। প্রতিটি বিষয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এ ধরনের মোটা মোটা বই। এতে রেডিমেড উত্তর মেলে। অনেক শিক্ষকেরও বিষয়টি পছন্দ। কারণ তাতে ক্লাসে পড়ানোর জন্য নিজের তেমন প্রস্তুতি নিতে হয় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনে করে— নোট-গাইড বই ক্ষতিকর। সর্বোচ্চ আদালত তো নোট-গাইড বই নিষিদ্ধ করার পক্ষেই রায় দিয়েছেন। কিন্তু ব্যবসায়ীদের যে লাভ চাই! কে তাদের রুখবে? দুর্ভাগ্য যে, অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছে শিক্ষক ও স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অনেকে। কে তাদের সামাল দেবে?

মাত্র আট বছরে বিনামূল্যের বই ছাপাতে হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ। শেখ হাসিনার সরকারের এ সিদ্ধান্ত ড্রপ আউট কমিয়েছে। স্কুলে স্কুলে বাড়ছে শিক্ষার্থী। গত বছর (২০১৬) অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২৩ লাখ ৪৬ হাজার পরীক্ষার্থী। আর ক্লাস ফাইভে পরীক্ষা দিয়েছিল প্রায় ৩১ লাখ ছাত্রছাত্রী। শিক্ষার প্রসারে সরকারের যে মনোযোগ, তাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এখন কাজের বুয়া, দিনমজুর, বস্তিবাসী, গাড়ির চালক-হেলপার, কারখানার শ্রমিক— সব পরিবারে রয়েছে ছাত্রছাত্রী। রাজধানীর ফুটপাত 'দখল করে থাকা' ছিন্নমূল পরিবারগুলোর ছেলেমেয়ের হাতেও ৩১ ডিসেম্বর দেখেছি গোলাপি রঙের রিপোর্ট কার্ড; ফাইনাল পরীক্ষায় কোন বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে সেটা অনেকে মিলিয়ে দেখছে গভীর আগ্রহ নিয়ে। এ বছরেই এক ধনী পরিবারে আয়োজিত একটি 'পার্টি'র কথা শুনেছি তাতে অংশগ্রহণকারী একজনের কাছে। মেয়ের জিপিএ ৫ পাওয়া উপলক্ষে আয়োজিত এ জমকালো পার্টিতে অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তিকে ওই বাসার কাজের বুয়া বলেছিল, 'আপনারা যে জিপি-প্যাচের কথা বলছেন, আমার মাইয়াও সেই প্যাচ পেয়ে পাস করেছে।' প্রকৃতই, প্যাচ বা পাঁচ পাচ্ছে এখন ধনী-নির্ধন-মধ্যবিত্ত অনেক অনেক পরিবারের সন্তান। শিক্ষার মানে হেরফের অবশ্যই আছে। শহর ও গ্রামের মানে পার্থক্য আছে। রাজধানীর ভেতরেও পার্থক্য আছে। যে পরিবার সন্তানের পেছনে মাসে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা ব্যয় করে এবং যে পরিবারের সন্তান বিনামূল্যের বই না পেলে পড়তই না— তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে স্কুলের ব্যবস্থাপনা ভালো এবং যে স্কুলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে অপরের ধন আত্মসাতের প্রবণতা প্রকট, সেখানেও শিক্ষামানে বিস্তর পার্থক্য। এই ব্যবধান দূর করাই এখনকার চ্যালেঞ্জ। এটাও মানি— এ চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়া খুব কঠিন। বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয়, ছাত্র ও শিক্ষকদের সংগঠনগুলো এবং এমনকি রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ বিষয়ে উদাসীন।

ajoydg@gmail.com